TIP Report on Bangladesh 2010-in Bangla

## বাংলাদেশ (স্তর ২ পর্যবেক্ষণ তালিকা)

বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় এবং বাধ্যতামূলক যৌন শোষণের জন্য বাংলাদেশ থেকে এবং বাংলাদেশকে ট্রানজিট দেশ হিসাবে ব্যবহার করে নারী-পুরুষ এবং শিশু পাচার করার ঘটনা ঘটে থাকে। পাচার হওয়া বাংলাদেশিদের একটা বড় অংশই হলো ভূয়া নিয়োগ পেয়ে বিদেশ গমনকারী পুরুষ, যারা বিদেশে গিয়ে প্রায়শই শ্রমদানে বাধ্য হন বা ঋণের বেড়াজালে আটকে পড়েন। পতিতাবৃত্তি ও দাসত্বমূলক শ্রমসহ অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুরা অভ্যন্তরীণভাবে পাচারের শিকার হয়। কিছু শিশুকে তাদের বাবা-মায়েরাই এই ধরনের কাজ করার জন্য বিক্রি করে দেন, আর অন্যদেরকে প্রতারণা ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে শ্রমদান অথবা পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। পতিতাবৃত্তির কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশি নারী ও শিশুকে ভারতে পাচার করা হয়ে থাকে।

জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশি নারী-পুরুষরা সাধারণত বৈধভাবে এবং চুক্তির শর্তে স্বেচ্ছায় সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, লেবানন, মালয়েশিয়া, লাইবেরিয়া ও অন্যান্য দেশে যান। যারা বৈধভাবে বিদেশ যেতে চান তারা 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টালন্যাশন্যাল রিক্রুটিং এজেন্সিস' বা বায়রার অন্তর্ভুক্ত ৭২৪টি রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নির্ভর করেন। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এজন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১,২৩৫ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ বৈধভাবে নিয়ে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদেরকে ১০০ বা ১৫০ ডলার মাসিক বেতনের চাকুরিতেও পাঠানোর আইনগত অনুমতি  দেয়া হয়েছে। এনজিওগুলো জানায়, এসব চাকুরির জন্য অনেক শ্রমিকের কাছ থেকেই ৬,০০০ ডলার পর্যন্ত বর্ধিত অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। মালয়েশিয়ার ওপর প্রকাশিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করা অন্যান্য দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের চেয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের কাছ থেকে রিক্রুটমেন্ট ফি হিসাবে তিন গুণেরও বেশি অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আরো জানায়, অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক প্রতারণামূলক শর্তে ভূয়া নিয়োগের শিকার হন। ফিও আদায় করা হয় অনেক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও জানায়, উচ্চহারের রিক্রুটমেন্ট ফি'র কারণে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদানের ঝুঁকি পরিস্থিতি আরো বাড়িয়ে তোলে। নারীরা বিদেশে সাধারণত গৃহপরিচারিকার কাজ করেন; এদের কেউ কেউ বাধ্যতামূলক শ্রমদানের পরিস্থিতিতে বা ঋণের বেড়াজালে আটকে পড়েন; যার ফলে তাদের চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের কাউকে কাউকে কখনও কখনও শেষমেষ পতিতাবৃত্তির জন্য পাচার করা হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ, দাসের মত বাসাবাড়ির কাজ করানো বা বাধ্যতামূলক শ্রমদানের জন্য দেশের অভ্যন্তরেও শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের পাচার করার ঘটনা ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক নানা প্রতিবেদনে এসেছে যে, পতিতালয়ের মালিক ও পতিতাদের দালালরা খদ্দেরদের কাছে বাংলাদেশি মেয়েদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তাদের দেহে স্টেরয়েড প্রয়োগ করে থাকে যার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক। বাংলাদেশের পতিতালয়গুলোয় ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়েসি শতকরা ৯০ জন নারী এই স্টেরয়েড গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ মানব পাচার বিলোপের সর্বনিম্ন মান পুরাপুরি মেনে চলে না; তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও নারীদের পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার রোধের চেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সরকার শ্রমিক পাচারকারীদের ফৌজদারি অপরাধের আওতায় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বা তাদের দোষী সাব্যস্ত করছেন না - বিশেষ করে যারা পাচারের জন্য বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ করছে - তাদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অনুরূপভাবে, উচ্চহারে রিক্রুটমেন্ট ফি এবং অন্যান্য ধরনের জালিয়াতিমূলক নিয়োগ ঠেকানোর ম্যাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক শ্রম বন্ধ করার ক্ষেত্রে বর্ধিত প্রয়াস না চালানোর কারণে বাংলাদেশকে 'টায়ার ২ ওয়াচ লিস্ট' বা 'দ্বিতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণ তালিকায়' রাখা হল। কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের সদস্য আগের মত এখনও বিশ্বাস করেন যে, বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং ঋণের বেড়াজালে আটকে পড়ার ঘটনাকে শ্রমিক পাচার হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, বরং বিবেচনা করা হয় নিয়োগ জালিয়াতি হিসেবে, যা অনিয়মিত অভিবাসীদের ব্যাপারে হয়ে থাকে।

**বাংলাদেশের জন্য সুপারিশঃ** বাধ্যতামূলক শ্রমকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য আইনের খসড়া তৈরি করে তা পাশ করুন; শ্রমিক পাচার বিরোধী উদ্দেশ্যসমূহকে জাতীয় মানব-পাচার বিরোধী নীতি ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করুন; প্রতারণামূলক নিয়োগ ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম পাচারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলকভাবে আইন প্রয়োগ করুন এবং শাস্তি বৃদ্ধি করুন; শ্রমিক পাচার অপরাধের শাস্তি বিধানের জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করুন; বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ওপর নজরদারি আরো বৃদ্ধি করুন যাতে তারা মানব পাচারের জন্য অনুকূল রীতিনীতি পরিহার করে; বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে কনসুলার সুবিধাদানসহ পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা সেবার ব্যবস্থা করুন; এবং সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান জোরদার করুন।

## আইনগত ব্যবস্থা

এই প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সরকার পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার রোধ বা বাধ্যতামূলক শ্রমদান রোধে জোরদার তৎপরতা চালানোর প্রমাণ দিতে পারেনি। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত)-এর আওতায় পতিতাবৃত্তি অথবা বলপূর্বক দাসত্বের জন্য নারী ও শিশু পাচার নিষিদ্ধ করে। এছাড়া দণ্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পতিতাবৃত্তির জন্য ১৮ বছর বয়সের নিচের কাউকে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। যৌনকর্মের জন্য মানব পাচার বিরোধী এসব আইনে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধানসহ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পর্যন্ত বিধান রয়েছে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানুষ পাচারকারীর শাস্তি হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এসব সাজা অত্যন্ত কঠোর, যা সেগুলো ধর্ষণের মত অন্যান্য মারাত্মক অপরাধের সাজার মাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু এই অপরাধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডের বিধান এসব অপরাধ নিবৃত্তকরণের মত পর্যাপ্ত কঠোর নয়।

এই প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়ে সরকার ৩২ জন পতিতাবৃত্তির লক্ষ্যে মানব পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে; এদের মধ্যে ২৪ জনের হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে আর ৮ জনের

হয়েছে অন্যান্য লঘু দণ্ড। এক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্তের এই সংখ্যা ২০০৮ সালের মোট সাজাপ্রাপ্তের সংখ্যা ৩৭-এর চেয়ে কিছুটা কম। শ্রমিক পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য কারো শাস্তি হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জানা যায়নি। ২০০৯ সালে সরকার যৌনকর্মের লক্ষ্যে মানব পাচারের সন্দেহজনক ৬৮টি ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং এ ধরনের ২৬টি ঘটনার বিচার হয়। আগের বছর, অর্থাৎ ২০০৮ সালে তদন্ত করা হয় ১৩৪টি ঘটনার এবং বিচার করা হয় ৯০টির। ঊনপঞ্চাশটি মামলায় আসামিরা অব্যাহতি পেয়েছেন; তবে বাংলাদেশি আইনে 'অব্যাহতি' বলতে বিচার ব্যবস্থার বাইরে নিষ্পত্তি করা মামলা এবং সাক্ষীদের আদালতে হাজির না হওয়াও বোঝায়। প্রতারণামূলক নিয়োগ এবং সম্ভাব্য মানব পাচারের সাথে জড়িত শ্রমিক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও শ্রমিক পাচার অপরাধের জন্য কারো বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া বা শাস্তিদানের কোন খবর সরকার প্রকাশ করেনি। বিচার ব্যবস্থায় বড় ধরনের মামলা জট এবং পদ্ধতিগত ফাঁক-ফোকরের ফলে সৃষ্ট সময় অপচয়ের কারণে যৌন কাজের জন্য মানব পাচারের মামলাগুলোও এর কবলে পড়ে। যৌন কাজের জন্য মানব পাচারের মামলাগুলোর বেশিরভাগ পরিচালনা করে থাকে দেশের ৩২টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪২টি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিরোধী আদালত। এই সব আদালত সাধারণত নিয়মিত বিচারিক আদালতগুলোর চাইতে অধিকতর দক্ষ।

আলোচ্য সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের "মানব পাচার বিরোধী মনিটরিং সেল" পাচারকালে করা গ্রেফতার, বিচার এবং উদ্ধার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে এবং মানব পাচার বিরোধী আঞ্চলিক শাখাগুলি থেকে পাওয়া স্থানীয় পর্যায়ের তথ্যগুলির সমন্বয় ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে বলে জানা গেছে। আলোচ্য বছরে মানব পাচার ঘটনার সাথে সরকারি সংশিষ্টতার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কয়েকটি এনজিও কিছু সংসদ সদস্য, দুর্নীতিপরায়ণ রিক্রুটিং এজেন্সি এবং গ্রাম পর্যায়ের দালারদের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত থাকার কথা জানিয়ে বলেছে যে, রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সংঘবদ্ধ ব্যক্তিরা আদম পাচারের সাথে জড়িত ছিল। কয়েকটি এনজিও বলেছে, ঢাকায় অবস্থিত সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলির সাথে গন্তব্য দেশের কর্মচারিদের সাথে যোগসাজস রয়েছে, যাদের কারণে কখনও কখনও শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে দাসত্বের মত পরিস্থিতিতে পড়েন। নিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদেরও কেউ কেউ আদম পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার দায়ে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে এবং এই প্রতিবেদনে বিবেচ্য বছরের শেষ নাগাদও এই বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। সরকার সিয়েরা লিওনে কর্মরত কিছু বাংলাদেশি সৈনিকের মানব পাচার কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বা সহায়তা করার অভিযোগ বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করেছেন; তবে সরকার এসব অভিযোগের তদন্ত বা বিচারকাজ সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি। ২০০৯ সালে জাতীয় পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ২,৮৭৬ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে মানব পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের "মানব পাচার তদন্ত ইউনিটের" ১২ জন পুলিশ কর্মকর্তা মানব পাচার ঘটনা তদন্তের কলা-কৌশল শিক্ষা অব্যাহত রেখেছেন। অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিদেশী সরকারগুলোর কাছ থেকে মানব পাচার রোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। একটি খ্যাতনামা এনজিও তাদের ২০০৯ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের পরও মানবপাচার বিরোধী মামলার সংখ্যা বাড়েনি বা দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসেনি।

## সুরক্ষা

গত বছর সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বাধ্যতামূলক শ্রমদানের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের রক্ষায় সরকারের প্রচেষ্টার অভাব একটা অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় হয়েই রয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের একটা বড় অংশই বাধ্যতামূলক শ্রমদানের শিকার হন। পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের পদ্ধতিগতভাবে সনাক্ত করার এবং তাদের প্রেরণ করার মত জয়গা সরকারের নাই। আদালত, পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আভ্যন্তরীণভাবে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের নানা আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। প্রতিবেদনে ধরা সময়কালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা পাচারের শিকার ৬৮ ব্যক্তিকে সনাক্ত করে তাদের উদ্ধার করেছেন। এদের মধ্যে নারী ছিলেন ৩৮ জন , আর বাকি ৩০ জন ছিলেন পুরুষ। এসব উদ্ধারকৃতদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল কি না তা পরিষ্কার নয়। আগের বছর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা পাচারের শিকার ২৫১ ব্যক্তিকে সনাক্ত ও উদ্ধার করেছিলেন। সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট আশ্রয় ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা না করলেও, মানব পাচারসহ সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য আগের মতই ৯টি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে এসেছেন, এবং সেই সাথে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে পরিচালনা করে আসছেন একটি 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' বা এক স্থানেই সংকট সমাধান কেন্দ্র। এসব আশ্রয় কেন্দ্র এনজিওদের সহায়তায় পাচারের শিকার ব্যক্তিদের আইনগত এবং চিকিৎসা এবং মনঃস্তাত্ত্বিক সেবা দিয়েছে। গত বছর বাংলাদেশে ৩৮৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারি ও এনজিওর সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা পেয়েছেন। এদের মধ্যে হয়ত কেউ কেই পাচারের শিকার ব্যক্তি ছিলেন। সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পাচার ও শোষণের শিকার বাংলাদেশি নারীদের জন্য রিয়াদ, জেদ্দা, আবু ধাবি এবং দুবাইতে আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা সনাক্ত হওয়ার পর পাচারের শিকার ব্যক্তিদেরকে তাদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তকাজ ও বিচারকাজে সহায়তা করতে উৎসাহিত করেছেন; তবে আলোচ্য সময়ে পাচারের শিকার কত জন এই কাজে সহযোগিতা করেছেন তার কোন প্রমাণাদি নেই। পাচার হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে পাচারের শিকার ব্যক্তি যে সব বেআইনি তৎপরতায় স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, কর্তৃপক্ষ সাধারণত সেগুলোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জায়গা না পাওয়া গেলে নারীদেরকে পুলিশ বা আদালতের তত্ত্বাবধানে জেলে রাখা হয়েছে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ে ভারতের স্থানীয় পুলিশ পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহারের জন্য পাচারের শিকার বাংলাদেশি ৭ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীকে উদ্ধার করে। কোন কোন নারী এক বছরেরও বেশি সময় ভারতের আশ্রয় কেন্দ্রে থাকার পর ২০১০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এনজিও এবং ভারত সরকারের সাথে কাজ করা শুরু করেন। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হয়নি।

শ্রম আইন এবং নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের কিছু ব্যবস্থা নেয়ার এবং ক্ষতিপূরণ পাবার ব্যবস্থা দৃশ্যত বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়রা আপোষের যে ব্যবস্থা প্রায়শই নিয়েছিল তাতে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না, এবং এর ফলে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলির অবৈধ কর্মকাণ্ডও বন্ধ হয়নি। এসব এজেন্সির সবগুলোই বায়রার সদস্য। বিএমইটি বা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর দায়িত্ব হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোর ওপর নজরদারি করা এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থার ওপর নজর রাখা। বিএমইটি শ্রমিকদের অভিযোগ নিয়ে বায়রার সাথে প্রায়শই দেন-

দরবার করে। শ্রমিকদেরকে বায়রার অভিযোগ প্রক্রিয়ায় আনা হয়, কেননা, এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদেরকে দ্রুত অর্থ প্রদান করা হয় (যদিও, শ্রমিকদেরকে যে পরিমাণ অর্থ থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে এবং যে পরিমাণ রিক্রুটমেন্ট ফিস তারা পরিশোধ করেন, তার চেয়ে অনেক কম অর্থ দেয়া হয়।) এবং কত অর্থ ফি হিসাবে দেয়া হয়েছিল তার প্রমাণাদি তেমন একটা লাগে না। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলো যে ফি নেয় তার বেশিরভাগই নেয়া হয় অবৈধভাবে; সুতরাং এগুলির কোন রশিদও থাকে না। যদি "বড় ধরনের" বিরোধ দেখা দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি তার লাইসেন্স হারাতে পারে; তবে এনজিওগুলি জানায় যে, এজেন্সি মালিকদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যরা নতুন এজেন্সির জন্য আবেদন করেন এবং তারা লাইসেন্স লাভে সফলও হন। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করা যায়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আলোচ্য বছরে সরকার মোট প্রাপ্ত ১,০৩০টি শ্রমিক অভিযোগের মধ্যে ৮৯৩টির নিষ্পত্তি করেছে। পূর্ববর্তী বছরে মোট ১,০১০টির মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল ৭৪৫টি অভিযোগের। এই সব অভিযোগের কোন কোনটি কয়ে থাকতে পারে আদম পাচার সংক্রান্ত ঘটনায়। এনজিওগুলি অভিযোগ করে যে, বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই অভিযোগের ব্যপারে উদাসীন থাকেন এবং বিদেশে অভিযোগ করে প্রতিকার পাওয়ার ঘটনাও বিরল। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা বা আইওএম প্রতিষ্ঠিত একটি কফি স্ট্যান্ডের জন্য জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে। পাচারের শিকার ব্যক্তিরা এই কফি স্ট্যান্ড চালান।

## প্রতিরোধ

আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ সরকার বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বলপূর্বক শ্রম আদায়ের ঘটনা রোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে যে সব পাচারের ঘটনা হয় তা রোধে মোটামুটি রকমের একটা চেষ্টা চালিয়ে গেছে। রিপোর্টে উল্লেখিত সময়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) মানব পাচারে সম্ভাব্য সহায়ক হতে পারে - এমন প্রতারণাপূর্ণ শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ১টি রিক্রুটিং এজেন্সি বন্ধ করে দেয় এবং ৬টি এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করে এবং তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত করে। পূর্ববর্তী বছর বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ৯টি রিক্রুটিং এজেন্সি এবং লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া হয়েছিল ২৫টি এজেন্সির। প্রতারণাপূর্ণ শ্রমিক নিয়োগ এবং অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে বিএমইটি এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে ৮৩০,০০০ মার্কিন ডলার সম পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায় করে। সরকার বায়রাকে শ্রমিক নিয়েগের ফি নির্ধারণ, এসব এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান, বিদেশে নিয়োগের জন্য শ্রমিকদের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন; কিন্তু শ্রমিক নিয়োগকারী এজেন্সিগুলির এই জোটকে তাদের কর্মকাণ্ড অভিবাসী শ্রমিককে যাতে বিদেশে ঋণের বেড়াজালে জড়িয়ে না ফেলে তেমন তৎপরতা রোধে পর্যাপ্ত নজরদারি করেননি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নানা ফোরামে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার বিরোধী নানা বার্তা প্রচার করেছে। এগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান, আলোচনা অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, সমাবেশ অনুষ্ঠান এবং পোস্টার প্রকাশ করা। মানব পাচার বিরোধী মনিটরিং সেল জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের ৬৫টি ইউনিটেই অনুষ্ঠিত মাসিক প্রচার বৈঠকে সরকারি কর্মকর্তারা পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করেছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব নিয়মিত জাতীয় মানব পাচার বিরোধী কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন। এই কমিটি দেশের ৬৪টি জেলার জেলা পর্যায়ের মানব পাচার বিরোধী কমিটির ওপর নজরদারি করে থাকে। এছাড়াও স্বরাষ্ট্র সচিব এনজিওগুলোর সাথে সমন্বয় বৈঠক করে থাকেন; যদিও কোন কোন এনজিও

জানায় যে, এই সব বৈঠকে বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং মানব পাচার বিষয়ের ওপর সে রকম জোর দেয়া হয়না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট অন কমব্যাটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন এন্ড চিলড্রেন" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সরকার ২০০৮ সালে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করলেও জাতীয় পর্যায়ে এই নিবন্ধনের হার শতকরা ৭ থেকে ১০ ভাগ মাত্র; এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরই জন্ম নিবন্ধন করা হয়না। আলোচ্য ২০০৯ সালে সরকারকে জবরদস্তিমূলক শ্রম এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌনকর্ম হ্রাসে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশ সরকার বিদেশে মোতায়েন শান্তিরক্ষীদের মানব পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ২০০০ সালের মানব পাচার চুক্তিতে সাক্ষর করেনি।